নির্দলীয় ছাত্র রাজনীতি চাই

মোহাম্মদ শাহজাহান

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ২২ অক্টোবর ২০১৯

বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনাটি সমগ্র জাতিকে একটি বিশাল ধাক্কা দিয়েছে। টানা ৬/৭ ঘণ্টা নির্যাতনে আবরার নিহত হয়। এ সময়ের মধ্যে পুলিশ নির্যাতনের খবর পেয়ে হলগেটে আসে। কিন্তু ছাত্রলীগের ভয়ে হলে প্রবেশ না করে গেটেই বসে থাকে। এরপর তারা চলে যায়। রাত ৮টার দিকেই আবরারকে তার কক্ষ থেকে ডেকে নিয়ে যায় খুনি ছাত্রদের একজন। এমন না যে গভীর রাতে আবরারকে নির্যাতন করা হয়েছে। এতটা সময়ের মধ্যে বুয়েটের ভিসি, প্রোক্টর, হলের প্রভোস্ট, হাউজ টিউটরগণ নির্যাতনের খবর পায়নি, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওই বর্বর হত্যাকাণ্ডটি ঘটার পরও ওই ভিসি ৩৬ ঘণ্টা তার বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। তিনি আবরার হত্যার কোন প্রতিক্রিয়া জানাননি, এমনকি নিহত আবরারকে একটিবারের জন্য দেখতেও যাননি। এতবড় অমানবিক অপরাধের পরেও তিনি এখনো ভিসি পদে বহাল তবিয়তে রয়েছেন। যেই পুলিশের দল হলগেট থেকে ফিরে গেল, তারাও তো নিশ্চিতভাবেই আরাম-আয়েশেই রয়েছে। অথচ পুলিশের দলটি যদি হলে যেত, তাহলে আবরারকে এভাবে জীবন দিতে হতো না।

এই অবস্থায় আবরার হত্যার জন্য খুনি ছাত্রদের পাশাপাশি বুয়েটের ভিসি, প্রোক্টর, হল প্রভোস্ট এবং গেটে এসে ফিরে যাওয়া পুলিশের দলটিও কম দায়ী নয়।

আবরার হত্যার পর বুয়েটের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের ৩০ জন শিক্ষক একটি লেখায় তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষকগণ লিখেছেন- 'আবরার হত্যার মাধ্যমে সমগ্র বুয়েটই খুন হয়ে গেছে।' সব বর্বর হত্যাকাণ্ডের পর, যা হয় এবারও তা-ই হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দায়িত্বশীল নেতারা বলছেন, আবরার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। সেই লক্ষ্যে দ্রুত বিচার আইনে মামলার বিচার কাজ করার প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আমরা যা বলি তা করি না বা করতে পারি না। ১২ অক্টোবর একটি জাতীয় দৈনিকে (প্রথম আলো) বলা হয়েছে, স্বাধীনতার পর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১৫১ জন শিক্ষার্থী প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৪ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ জন করে, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং হযরত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন করে শিক্ষার্থী খুন হয়েছেন। সর্বশেষ আওয়ামী লীগের টানা ১১ বছরের শাসনামলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ জন

শিক্ষার্থী খুন হয়েছেন। এদের মধ্যে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীই বেশি। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এতগুলো হত্যাকাণ্ডের তেমন কোন বিচার হয়নি। আর কোন কোনটির বিচার হলেও একজনও নাকি শাস্তি পায়নি। আসামিরা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন বা দেশেই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

আবরার হত্যার পর দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর বিভিন্ন কায়দায় বর্বর ও অমানবিক নির্যাতনের যেসব খবরাখবর প্রকাশিত হচ্ছে, তা দেখে নিজেদেরকে স্বাধীন দেশের নাগরিক ভাবতে লজ্জা করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। যোগ্যতার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীরা হলে উঠতে পারেন না। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের দয়ায় শিক্ষার্থীদের স্থান হয় গণরুমে। কিন্তু নিঃশর্তভাবে নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার জন্য প্রায়ই তাদের ডাক পড়ে। কোন কারণে কর্মসূচিতে অংশ নিতে না পারলে শিক্ষার্থীদের ওপর নেমে আসে গেস্টরুম নামের বর্বর নির্যাতন। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা গত ৭ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও ১৩টি আবাসিক হলে ৫৮টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়েছে বলে জানা গেছে। অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী এতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নিগ্রহের শিকার কাউকে পিটিয়ে পুলিশে দেয়া হয়েছে, আবার কাউকে মারধর করে হল থেকে বের করে দিয়ে তাদের

সিট দখল করে নেয়া হয়েছে। আবার কোন কোন সময় নিজ দলের নেতাকেও ছাত্রদল ও শিবিরকর্মী বানিয়ে পিটিয়ে হলছাড়া করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গেস্টরুম মূলত তৈরি করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের আত্মীয়স্বজন ও দর্শনার্থীদের জন্য। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি)তে প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীদের কাছে গেস্টরুম একটি আতঙ্কের নাম। এখানে প্রায় প্রতি রাতেই হলের নবীন শিক্ষার্থীদের হাজিরা দিয়ে সারা দিনের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি করতে হয় সিনিয়রদের কাছে। অনেকটা চাকর-বাকরের মতো নবাগত ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। নেতাদের সালাম না দেয়া বা তাদের আদেশ মান্য না করলে অথবা মিছিল-মিটিংয়ে কোন কারণে হাজির না হলে তাদের ওপর নেমে আসে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। এছাড়া শিবির ও ছাত্রদল সন্দেহে প্রায়ই নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে। ম্যানার (আচরণ) শেখানোর নামে হলের প্রতিটি গেস্টরুমকেই টর্চার সেলে পরিণত করা হয়েছে। ঢাবির ১৩টি হলের প্রায় অর্ধশত কক্ষকে ‘টর্চার সেল’ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আবার কখনও কখনও শয়নকক্ষ, অতিথি কক্ষ, আহার কক্ষ, হলের ছাদ, মাঠ বা গণরুমগুলো টর্চার সেলে রূপান্তরিত করা হয়। এসব টর্চার সেলে লাঠি, হকিস্টিক, গ্যাস পাইপ, ক্রিকেট স্ট্যাম্প, লোহার রড দিয়ে চালানো হয় ভয়াবহ নির্যাতন। এসব কারণে অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন সময়ে হল ছেড়ে চলে গেছে। ছেলেদের তুলনায় কম হলেও মেয়েদের হলেও মাঝে মধ্যে

ঘটে নির্যাতনের ঘটনা। গেস্টরুম দুই ধরনের। একটি ফরমাল, অন্যটি মিনি গেস্টরুম। সপ্তাহে ৩ দিন ফরমাল, তিনদিন মিনি গেস্টরুম করানো হয়। আর একদিন ছুটি। হলগুলোতে রাত ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত গেস্টরুম কালচার চলে। এরপর রাত ৪টা পর্যন্ত প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের হলের বাইরে থাকতে বাধ্য করা হয়। জুনিয়র থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে সিনিয়র নেতারা গেস্টরুমে আসেন।

রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা যে রুমে থাকেন, সেখানে মিনি গেস্টরুম অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই তাদের উপর চলানো হয় অমানবিক নির্যাতন। মিনি গেস্টরুমে সিনিয়র নামধারী মানুষরূপী বর্বর জানোয়ারদের চড়ে অনেক শিক্ষার্থীর কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার মতো দুঃসহ ঘটনাও ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে বন্ধুদের দিয়েও এসব কক্ষে শিক্ষার্থীদের মারধর করানো হয়। শারীরিক নির্যাতনের পাশপাশি চলে মানসিক নির্যাতন। বাবা-মা ভাই-বোন-পরিবার নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। সাত বছরে আলোচিত ৫৮টি নির্যাতনের ঘটনা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ভুক্তভোগী নির্যাতিত দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী হল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এক সমীক্ষায় বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০১৩ সালে ৪০ জন, ২০১৪ সালে ২২, ২০১৫ সালে ১৪, ২০১৬ সালে ৪, ২০১৭ সালে ১২, ২০১৮ সালে ২৬ এবং চলতি বছর এ পর্যন্ত ২৮ জন শিক্ষার্থী হল ও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে ঐতিহ্যবাহী ছাত্রলীগের বর্তমান সময়ের

গুণ্ডাপাণ্ডাদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এগুলো গণমাধ্যমে প্রকাশিত বহুল আলোচিত ঘটনা। এর আড়ালেও আরও অনেক এমন বর্বর নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে যেগুলো গণমাধ্যমে প্রকাশ পায়নি বা ভীতসন্ত্রস্ত নির্যাতিতরা আতংকে ও ভয়ে মুখ খোলেননি। গেস্টরুমে নির্যাতনের কারণে পরবর্তী সময়ে অসুস্থ হয়ে আবুবকর ও হাফিজুর মোল্লা নামের দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু এবং এহসান রফিক নামে একজনের চোখ প্রায় দৃষ্টিহীন হওয়ার ঘটনা দেশের মানুষকে নাড়া দিয়েছিল।

আবরার হত্যার পর সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বর নির্যাতনের যেসব খবর গত কয়েকদিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, এগুলো নিয়ে ইচ্ছে করলে কেউ বড় ভলিউমের কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন। সর্বশেষ, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির সবচেয়ে বিশ্বস্ত পরীক্ষিত বন্ধু দৈনিক সংবাদ ২০ অক্টোবর চার কলাম লিড নিউজে লিখেছে- ঢাবি ক্যাম্পাস ও হলগুলোতে সাত বছরে ২৮২ শিক্ষার্থী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ভয় ও আতংকের কারণে এতদিন চুপচাপ থাকলে বুয়েটে আবরার হত্যার পর অনেকেই ইদানিং এ বিষয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি হলের গেস্টরুম ও রাজনৈতিক কক্ষগুলো (পলিটিক্যাল রুম) সাধারণ ছাত্রদের কাছে রীতিমতো আতংকের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং 'টর্চার সেল' হিসেবে এসব কক্ষ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সংবাদ-এর

রিপোর্টে বলা হয়- গত ৭ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও ছাত্রদের আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ৯২টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়েছে। এতে ২৮২ জন শিক্ষার্থী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ঢাবির হলগুলোতে গ্রুপভেদে সপ্তাহে ৪/৫ দিন গেস্টরুম করানো হয়। আর ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপের সিনিয়ররা গেস্টরুমে নবীন শিক্ষার্থীদের আচরণ শেখানোর নামে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে আসছে। নবীনদের গেস্টরুমে আসা বাধ্যতামূলক। কেউ কোন কারণে না এলে তাকে চরম মূল্য দিতে হয়। ভয়ে কোন শিক্ষার্থীই মুখ খোলেন না। তাহলে নির্যাতনের মাত্রা বর্বর আকার ধারণ করবে। সংবাদের রিপোর্টে ছাত্রলীগের নির্যাতনের খতিয়ান এবং টর্চার সেলে ছাত্রদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতনের চিত্র দেখলে মনে হয় ছাত্রনেতা নামধারী পিশাচরা সাধারণ ছাত্রদের তাদের দাস মনে করে। ব্রিটিশ আমলের জমিদারদের মতো এসব বর্বর ছাত্রনেতারা হলগুলোকে তাদের বাপ-দাদার তালুক মনে করছেন বলেই মনে হয়। এরাই ছাত্রলীগের কলংক। এসব কলংকৃতদের দল থেকে শুধু ঝাড়– দিয়ে ঝেটিয়ে বিদায় করলেই হবে না, ঐতিহ্যবাহী ছাত্রলীগের গৌরবোজ্জল ইতিহাসকে ম্লান করার জন্য ওদের গ্রেফতার করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে।

ছাত্রছাত্রী এবং গণদাবির মুখে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি আপাতত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। দেশের ছাত্ররাজনীতিকে আসলে ধ্বংস করে

দিয়ে গেছে দুই নীতিভ্রষ্ট স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ। এ দুজন ছাত্রদের লাইসেন্স-পারমিট দিয়েছেন, অছাত্রদের ছাত্র বানিয়ে হলে ঢুকিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে সন্ত্রাসের বীজ বপন করে গেছেন। বিএনপি-জামায়াতের শাসন অবসানের পর সামরিক ও সাম্প্রদায়িক শাসকদের দ্বারা সৃষ্ট ও পালিত অনেকেই সময়-সুযোগমতো আওয়ামী লীগ শাসনামলে ছাত্রলীগ ও যুবলীগে প্রবেশ করে দুর্বৃত্তপনা শুরু করে দিয়েছে বলেই অনেকে মনে করছেন। এরশাদের আমলে সরকারি আনুকূল্যে যখন চর দখলের রাজনীতি শুরু হয়, জাতীয় পার্টির ছাত্র সংগঠন যখন হলে হলে সন্ত্রাসের রামরাজত্ব কায়েম করে তখন দেশের প্রথম সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতি, দেশ ও জাতির আলোকিত মানুষ প্রয়াত রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী দেশে ৫ বছরের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি আরো বলেছিলেন, সাধারণ ছাত্রদের সমর্থনে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ইত্যাদি ছাত্র সংগঠনগুলো নতুনভাবে গঠিত হোক। এসব সংগঠনগুলোর গঠনতন্ত্র এবং কার্যক্রম কেমন হবে, বিচারপতি চৌধুরী সে সম্পর্কেও কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

আবরার হত্যার পর এখন আবার নতুন করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার জোর দাবি উঠেছে। কেউ বলছেন, এদেশে ছাত্র রাজনীতির নামে যে সন্ত্রাস ও কুকর্ম চলছে, তা আর চলতে দেয়া যায় না। এ পক্ষের দাবি হচ্ছে- ছাত্র রাজনীতি

একেবারেই বন্ধ করে দেয়া উচিত। এই প্রস্তাব সমর্থনের আগে আমরা ছাত্র রাজনীতির সোনালি অতীত নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই। বাংলাদেশে রাজনীতির শত বছরের ইতিহাসে দেখা যায়, ছাত্র রাজনীতির বিশাল অর্জন, তা বলে শেষ করা যাবে না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মাতৃভাষার আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীরাই জীবন দিয়েছেন। বাংলাকে মাতৃভাষা করার জন্য যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়, তার নেতৃত্বের পুরোভাবে ছিলেন ছাত্রসমাজ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতারা নন, ছাত্রছাত্রীরাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথ কাঁপিয়ে তোলে। ছাত্র-যুবকরাই সেদিন জীবন দান করেন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের মার্শাল ল' জারির পর ছাত্ররাই সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে। ১৯৬১ সালে শিক্ষা কমিশন বাতিলের দাবিতে সারা বাংলায় ছাত্রসমাজ আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফার আন্দোলনে মাজহারুল বাকি, আবদুর রাজ্জাক, নূরে আলম সিদ্দিকীসহ ছাত্রলীগের নেতারা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের প্রায় সব নেতাকে গ্রেফতারের পর ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ঢাকাসহ পূর্ব বাংলায় যে হরতাল হয়, তাতে ছাত্র এবং শ্রমিকরাই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রলীগের বহু নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্ররাই নেতৃত্ব দেয়। ছাত্র

আন্দোলনেই স্বৈরশাসক এরশাদের পতন ত্বরান্বিত হয়।

বঙ্গবন্ধু বলেছেন, ‘ছাত্রলীগের ইতিহাস বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস।’ একই কথা ঘুরিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস- ছাত্রলীগের ইতিহাস। আওয়ামী লীগের দ্বারা যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না, বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগের মাধ্যমে তা করাতেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন ’৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী দলের নেতা। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে হয়েছে। ছাত্রলীগ যা করেছে, বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ এবং নির্দেশেই করেছে। ২ মার্চ ঢাবি বটতলায় প্রথম প্রকাশ্যে ছাত্রলীগের সভায় স্বাধীনতার পতাকা দেখা যায়। ৩ মার্চ ১৯৭১ পল্টনে ছাত্রলীগের বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়। ছাত্ররা বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেন। সভায় স্বাধীন বাংলাদেশের হাজার হাজার পতাকা উড়ানো হয়। ছাত্রলীগের ঐ সভায় ‘আমার সোনার বাংলা’কে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ঘোষণা করা হয়। ছাত্ররা বলে, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ২৩ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাসভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্রলীগের লাখ লাখ ছেলে অংশগ্রহণ করেন এবং জীবন দান করেন।

ছাত্রলীগকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা যাবে না। বঙ্গবন্ধু যথার্থই বলেছেন,

‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস- ছাত্রলীগের ইতিহাস।’ এদেশের ছাত্র রাজনীতি এবং ছাত্রলীগের ইতিহাস উজ্জ্বল ও গৌরবময়। মাথাব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলা তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নানা কারণে ছাত্র রাজনীতি কলুষিত হয়ে পড়েছে। ছাত্র রাজনীতির নামে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনগুলো জিয়া-এরশাদের আমল থেকেই অরাজকতা ও দুর্বৃত্তপনা চালিয়ে আসছে। বিগত বছরগুলোতে তা চরম আকার ধারণ করেছে। এমতাবস্থায় ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা সমস্যার সমাধান নয়। ছাত্র রাজনীতির নামে যে দুর্বৃত্তপনা এবং টর্চার সেলের নামে সাধারণ ছাত্রদের ওপর যে নির্যাতন চালানো হচ্ছে এর চির অবসান ঘটাতে হবে। প্রবীণ সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী সারা দেশে ৫ বছরের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার প্রস্তাব করেছেন। তিনি সম্প্রতি তার এক কলামে লিখেছেন- ‘ছাত্র রাজনীতির মঙ্গলের স্বার্থে আগামী ৫ বছরের জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর বর্তমান কার্যক্রম মুলতবি রেখে ওপর থেকে নেতৃত্ব চাপিয়ে দিয়ে নয়, সাধারণ ছাত্রদের সমর্থন ও নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্র সংগঠনগুলোকে পুনর্গঠন এবং তাদের কাঠামো ও গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হোক।’

আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ছাত্র রাজনীতি এবং ছাত্রলীগের সংগ্রামের সোনালি অতীতকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং একই সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের দুর্বৃত্তপনা চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে হবে।

সবশেষে দৈনিক সংবাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধের উদ্‌ধৃতি দিয়ে আজকের লেখার ইতি টানতে চাই। ১৩ অক্টোবর সংবাদ লিখেছে : ‘ছাত্র রাজনীতির পথ রুদ্ধ করা যাবে না। ... দলীয় পরিচয়ে ছাত্র রাজনীতির অপসুযোগ বন্ধ করতে হবে। ... আরপিও ৯০(বি)-এর তিন নম্বর ধারা অনুযায়ী দলীয় পরিচয়ে ছাত্র রাজনীতি করার সুযোগ নেই। সব রাজনৈতিক দলকে এ ধারা প্রতিপালন করতে হবে। ছাত্ররা রাজনীতি করবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। এ জন্য ছাত্র সংসদ থাকতে হবে, নিয়মিত নির্বাচন হতে হবে। কোন জাতীয় সংকট দেখা দিলে তখন ছাত্ররা সময়ের দাবি অনুযায়ী ভূমিকা রাখবে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা তাদের কাজ নয়। মোদ্দাকথা হচ্ছে, ছাত্ররাজনীতি হতে হবে নির্দলীয়। তাহলেই ছাত্র রাজনীতি সঠিক পথে ফিরবে।’

২১ অক্টোবর ২০১৯

[লেখক : সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা সম্পাদক]
bandhu.ch77@yahoo.com